প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন , প্রাক্ -বঙ্কিম উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার চিত্রণ ।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন, প্রাক্-বঙ্কিম উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার চিত্রণ।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় একটি নবতম সংযোজন হলেও বাংলা উপন্যাস কোন আকস্মিক সৃষ্টি নয়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শাখার আবির্ভাব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজীতে লেখা 'রাজমোহনস ওয়াইফ' (১৮৬৪ খ্রী:) রচনার পর বাংলা উপন্যাস হিসেবে যথার্থ Form নিয়ে প্রকাশিত হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রী:)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই আমাদের বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার পূর্বে কিছু কিছু উপন্যাস ধর্মী বাংলা কাহিনী লিখে বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিসেস হ্যানা ক্যাথারীন ম্যালেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, গোপীমোহন ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, লালবিহারী দে প্রমুখ উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছেন। প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাস হিসেবে তাঁদের এই কাহিনী ধর্মী রচনাগুলিই বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের এই উপন্যাসধর্মী রচনাগুলিতেও প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সমস্যার অস্তিত্ব কীভাবে রক্ষিত হয়েছে তা দেখানো এবং সেই সূত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই নব-উদ্ভূত শাখায় প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে লেখক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া। বিশেষ ভাবে টেকচাঁদ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের রচনার উপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় গৃহিত হবে।

১৮২৩ খ্রী: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস' । প্রাক্-বঙ্কিম যুগে ভবানীচরণের এই দুই গ্রন্থে কাহিনী সৃষ্টির প্রয়াস বাংলা উপন্যাসের প্রারম্ভিক পর্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের তখনও আবির্ভাব ঘটেনি। মিসেস হ্যানা ক্যাথারীন ম্যলেন্স নামে একজন বিদেশিনী বাংলায় লিখেছেন 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২ খ্রী:) । এছাড়া ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, লালবিহারী দে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, গোপীমোহন ঘোষ প্রাক্-বঙ্কিম যুগে যে নতুন সাহিত্যশাখা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন তার মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের ভিত তৈরী হয়ে যায় । ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূলত প্রাবন্ধিক ।'সামাজিক প্রবন্ধ' ,'পারিবারিক প্রবন্ধ' ,'আচার প্রবন্ধ' ,'সুপ্রবন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এই সব গ্রন্থ রচনা করে ভূদেব সেদিনের সমাজ জীবন, প্রাচীন শাস্ত্র কথা, বাঙালি হিন্দুদের কর্তব্যচেতনা, হিন্দু ধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ-রক্ষা, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর চিন্তাগভীর মূল্যবান আলোচনা তুলে ধরেন । কিন্তু তাঁর এইসব লেখায় বাংলা উপন্যাসের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয়নি । কিন্তু তাঁরই রচিত'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ খ্রী:) পর পর দুটি কাহিনী গ্রথিত করে 'সফল স্বপ্ন' ও'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে প্রকাশিত হয় । বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনে ভূদেবের এই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সার্থক অবদান রেখেছে । ভূদেবের পর বলতে হয় প্যারীচাঁদ মিত্রর কথা । টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে তিনি লিখতেন ।'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'রামারঞ্জিকা' , 'যৎকিঞ্চিৎ' ,'অভেদী' ,'আধ্যাত্মিকা' এই গ্রন্থগুলি তিনি লিখেছেন । সবই গদ্যে লেখা । একমাত্র 'গীতাঙ্কুর' সঙ্গীত সংকলন । এই প্যারীচাঁদ মিত্রই লিখেছেন'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রী:) অনেকে এই গ্রন্থে উপন্যাসের লক্ষণ রয়েছে বলে মনে করেছেন । ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে বলেছেন - ''আলালের ঘরের দুলাল'ই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস ।''[১] এ বিষয়ে ড: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেছেন - ''লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর ছোট একটি ইংরিজি প্রিফেসে তাঁর নিজের এই রচনাটিকে Original Novel বলে উল্লেখ করেছেন । বাংলায় লেখা ছোট ভূমিকাটিতেও উপন্যাস বলেই দাবি করেছেন ।''[২] কিন্তু ড: সুকুমার সেন এ বিষয়ে বলেছেন - ''আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা । বইটির নামেই উদ্দেশ্যমূলকতা ধরা পড়িয়াছে । যদিচ কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মতোই তবুও কয়েকটি কারণে বইটিকে রীতিমত উপন্যাস বলা চলেনা ।''[৩] লেখকের এই গ্রন্থটিকে তিনি' ডিকেন্সের পিক্‌উইক্ পেপার্স'এর মতো' চিত্রোপন্যাস' বলতে চেয়েছেন । আবার সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস ''একটি যথার্থ উপন্যাসের সকল লক্ষণ অঙ্গীভূত করেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে ।''[৪] সমালোচনা যাই হোক না কেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের'ঐতিহাসিক উপন্যাস' যেমন প্রাক্ -বঙ্কিম যুগে বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের কাজে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে তেমনি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ও উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ নিয়ে বাংলা উপন্যাসের ভিত্ নির্মাণের কাজ করে গেছে ।

প্রাক্ -বঙ্কিম উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার চিত্রণ বিষয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে (পুরোপুরি উপন্যাস না হয়েও উপন্যাস ধর্মী কাহিনী হিসেবে) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস', মিসেস হ্যানা ক্যাথারীন ম্যলেন্সের 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' ,ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের'সফল স্বপ্ন' ,'অঙ্গুরীয় বিনিময়' , প্যারীচাঁদ মিত্রের'আলালের ঘরের দুলাল' , কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' লালবিহারীদের

'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' , মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের' সুশীলার উপাখ্যান', গোপীমোহন ঘোষের ' বিজয় বল্লভ' প্রভৃতি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত কাহিনীতে নর - নারীর জীবনের মূল সমস্যা হিসেবে প্রেম ও বিবাহ- এ দুটি উপাদান যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ , শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় এ দুটি সমস্যা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে এই সব লেখক লেখিকার রচনায় তেটা উজ্জ্বলতা নিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেনি । সমকালীন সমাজজীবনকে আশ্রয় করে কখনো কাহিনীর ভেতরে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহের সমস্যার উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবে এসেছে, আবার কখনো সেজন্যে লেখককে নির্ভর করতে হয়েছে ইতিহাসের উপাদানের উপর । সে যাই হোক, উপন্যাস রচনার গোড়া থেকেই এ দুটি বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের' নববাবুবিলাস' (১৮২৩ খ্রী:) এ নববাবু বিবাহিত । কিন্তু বিবাহিত জীবনে যে প্রেম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থাকা স্বাভাবিক নববাবু এবং তার স্ত্রীর বিবাহের পর কোনদিন তা পাওয়া সম্ভব হয়নি । বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য প্রেম ছিল তখন সমস্যাকবলিত । 'নববাবুবিলাসে'র নায়ক নববাবু নিজেই এই কারণে দায়ী । কারণ তার নিজের পতিতালয়ে গমনের নিত্য অভ্যাস স্ত্রীর প্রতি এনে দিয়েছিল চরম অবহেলা এবং ঔদাসীন্য । কাজেই বিবাহের পর দাম্পত্য প্রেম প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়নি । নববাবুর জীবনকাহিনীর পরিচয় তুলে ধরে ভবানীচরণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই স্বামীকে বিপথগামী হতে দেখে বিবাহিত জীবনের চরম বঞ্চনাকে বুকে বয়ে নববাবুর স্ত্রী অন্য অবলম্বন খুঁজে নিয়েছেন । ফলে স্বামীর মতো তাঁরও চারিত্রিক স্খলন ঘটেছে । নববাবু বিলাসে বিবাহিত জীবনের সমস্যা সাংঘাতিক । নববাবু স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন নি অথচ পাঁচ কন্যার পিতা হয়েছেন এবং কন্যাদের বিবাহ দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

'নববাবুবিলাসে' প্রেম নেই , আছে কেবল বিবাহিত জীবনের সমস্যা ।

ভবানীচরণের' নববিবিবিলাসে' এক কুলবধূর চারিত্রিক অধঃপতনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে । বিবাহ এবং দাম্পত্য প্রেম এই দুইয়েরই প্রয়োজন নর - নারীর জীবনে । এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু এই স্বাভাবিকতায় বেসুর বাজে যখন বিবাহের পর স্বামীকে বেশ্যাগৃহে যেতে দেখে তার স্ত্রী । স্বামীর এই বিপথগামিতায় প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার হয়ে কুলবধূটি এক নাপিতনীর কুমন্ত্রনায় পড়ে উপপতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এক ডাকওয়ালার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল তার অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক । বিবাহ হয়েছে একজনের সঙ্গে , কিন্তু অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অন্য জনের সঙ্গে । এই ভাবেই বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য প্রেম মিছে হয়ে গেছে স্বামী - স্ত্রীর জীবনে । বিবাহিত জীবনই হোক আর স্বামীর কিংবা নিজের বিপথগামিতাই হোক নারীর জীবনে তখন প্রেমের কোন নিশ্চিত আশ্রয় ছিলনা । এই কারণে একসময়ে প্রেমিকের কাছেও প্রত্যাখ্যাত হতে হল সেই কুলবধূটির । তখন থেকেই তার জীবনে নেমে আসে দুর্দিনের অন্ধকার । প্রথমে দাসীবৃত্তি এবং পরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এই কুলবধূটি । তার বিপথগামিতাই তাকে বিচরানয়ে দাঁড় করিয়েছিল । প্রকৃত স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল । কিন্তু স্বামী - প্রেম বঞ্চনায় অভিমানী নারী স্বামীকে একদম পাত্তা দেয়নি । বিবাহের পর স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন যে নারীকেও টেনে আনে পতনের খাদে' নববিবিবিলাস' সেই কাহিনীকেই ফুটিয়ে তুলেছে । ভবানীচরনের এই কাহিনীধর্মী রচনার সাথে মিশে আছে নর-নারীর চারিত্রিক অধঃপতন , মিশে আছে প্রেম বুভুক্ষু বিবাহিতা নারীর দুর্ভাগ্যের প্রতি লেখকের আশ্চর্য মমত্ববোধ । প্রাক্ - বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ নিয়ে ভবানীচরণের দুই গ্রন্থেই নর - নারীর বিবাহোত্তর জীবনে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে ।

প্রাক্ -বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গে মিসেস হ্যানাক্যাথারীন ম্যলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২ খ্রী:) গ্রন্থটির বিষয় ও কাহিনী বিন্যাস গ্রন্থটিকে উপন্যাসের মর্যাদা দেয়নি ঠিকই , কিন্তু ''বইটিকে' প্রথম বাংলা উপন্যাস' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । এ বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু বিতর্কও উঠেছে । ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এটুকু মেনে নিয়েছেন যে বাংলা কথা-সাহিত্যের উদ্ভবে বইটির কিছু ভূমিকা আছে ।''[৫]

মিসেস হ্যানা ক্যাথারীন ম্যলেন্স এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থ সম্পর্কে' দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের' ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় ড: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেছেন' 'খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় মেয়েদের বিশেষ করে দাম্পত্য সম্পর্ক , স্বামীর প্রতি ব্যবহার , ছোটদের নীতিশিক্ষা , গরিব , অসুস্থ ও ঈশ্বরে -অবিশ্বাসী মানুষের প্রতি মেয়েদের কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন । এ ছাড়াও বাইবেল পাঠ (ফুলমণির মুখে বাইবেলের প্রচুর উদ্ধৃতি) , চার্চে যাওয়া , মেয়েদের শিক্ষা , ঋণের পাকে জড়িয়ে পড়ার বিপদ ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ আছে ।''[৬] এ প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেও বলেছেন " The above subjects are valued into a little story fictitious on tne whole , but founded upon facts."[৭] নীতিশিক্ষা , পারিবারিক জীবনবোধ যাই এই গ্রন্থের বিষয় বিন্যাসে স্থান পাক না কেন নর - নারীর জীবনের মূল সমস্যা প্রেম ও বিবাহের কিছু কিছু চিত্র এতে রয়েছে । বাংলা উপন্যাসে প্রেমের যে চিত্র ও বিবাহ সমস্যার উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালের লেখকদের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে উপন্যাসধর্মী রচনা হয়েও 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থে নর-নারীর বিবাহ সমস্যা , প্রেমের অস্তিত্ব এবং বিকাশের চিত্র তেমন নেই । এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন''একমাত্র সুন্দরীর বিয়ের ব্যাপারে যে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তা পারিবারিক রীতি থেকে

পৃথক , মুক্ত হৃদয়ের উত্তপ্ত বাসনাজাত বলে কিছুকাল মনে হয়েছিল । অবশ্য খুবই কম সময়ের জন্য । সুন্দরীর প্রেম উপন্যাসের বাস্তব অংশের সঙ্গে একেবারে বেমানান , বিলেতি জীবনযাত্রা থেকে ধার করে দেশী পোশাকে সাজানো জিনিস । তাও আবার খাঁটি নয় । কারণ এ প্রেম আসলে ঈশ্বরমুখিতা , হৃদয়োল্লাস নয় ।''[৮] চন্দ্রকান্তের প্রতি সুন্দরীর আকর্ষণকেও প্রেম বলা যায়না , এ এক ধর্মীয় আকর্ষণ ।

''সুন্দরী কহিল , না মহাশয় , এমত নয় । আমি চন্দ্রকান্তকে প্রত্যহ দেখি , ও তাঁহার পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রেমিক ব্যবহার জানি , এবং ধর্ম্মের বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অনুরাগ আছে , তাহাও আমি জ্ঞাতা আছি , কারণ তিনি প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে তেঁতুল গাছতলায় বসিয়া হিন্দু ও মুসলমান দাস দিগকে যীশুখ্রীষ্টের বিষয় বলিয়া সদুপদেশ দিয়া থাকেন ।''[৯]

ম্যালেন্সের কাহিনীতে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গও আছে । সে বিবাহ হিন্দুমতে তো নয়ই কারণ হিন্দুদের মধ্যে তখন বিধবা বিবাহ সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি । তাই বিবাহ খ্রীষ্টান মতেই হয়েছে । এ প্রসঙ্গে গ্রন্থের মধ্যেই উল্লেখ আছে , ''যদি সে বাবু বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন , তবে রানীকে বিবাহ করুন ;''[১০] বিবাহের পর দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ না ঘটায় নারীর জীবনে যে বঞ্চনা নেমে আসে তারও উল্লেখ আছে ম্যালেন্সের রচনায় । রানী বিধবা কিন্তু যতদিন তার স্বামী বেঁচেছিল তার ভাগ্যে দাম্পত্য প্রেমের প্রতিষ্ঠা আসেনি । গ্রন্থে বলা হয়েছে - ''তাহার স্বামীর মূর্খতা ও দুষ্টতা প্রযুক্ত সে তাহার সহিত সুখে বাস করিতে পারিতনা বটে , কিন্তু যদ্যপি উপযুক্ত স্বামীকে পাইত , তবে ঐ সকল গোলযাল কখন হইত না । বোধ হয় যদি বাবু তাহাকে বিবাহ করেন , তবে তাঁহারা উভয়ে বড় সুখে কালযাপন

করিবেন ।''[১১] গ্রন্থে বর্ণিত বিবাহ চিত্রটি সম্পূর্ণ খ্রীষ্টান মতে বিবাহের কথাকেই এ ভাবে স্পষ্ট করে তুলেছে । '' পরে আমরা গীর্জায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম , পাদরি সাহেব বরকে লইয়া আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন , অতএব তিনি প্রথমে আয়াকে বাপ্‌টাইজ করিয়া পরে রানীর বিবাহ দিলেন ।''[১২] বিবাহের চিত্রের মধ্য দিয়েও খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য কাজ করেছে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থে । প্রাক্ -বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের কিছু উপাদান নিয়ে ম্যলেন্সের এই কাহিনীতে বিবাহ সমস্যার এভাবেই চিত্রায়ণ ঘটেছে ।

প্রাক্ -বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় । কেননা ভূদেবের অন্যান্য রচনা নয় , একমাত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭ খ্রী:) এ আছে উপন্যাসের লক্ষণ । এই গ্রন্থে দুটি কাহিনী - 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। লেখক নিজেই তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্পর্কে বলেছেন ''ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে । তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধ নাই । উভয় উপন্যাসেই রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে , তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক । অপরাপর যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশ মাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় , কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে । ইংরাজীতে'রোমান্স অব হিস্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে , তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে । 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।''[১৩] আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রেম ও বিবাহের সমস্যা ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসের'সফল স্বপ্ন' কাহিনীতেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে । এর কাহিনীতে আছে এক অশ্বারোহী গভীর অরণ্যে এক হরিণ শিশুর জীবন ফিরিয়ে দিয়ে যে

স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সফলের কাহিনী । সিংহের আক্রমণে অশ্ব প্রাণ হারানোর পর অশ্বারোহী পদব্রজে বনের বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন । কিন্তু পথে দস্যু দলের কবলে পড়ে তাঁর স্বপ্ন মুছে যেতে থাকে । দস্যুরা তাকে বিক্রি করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে । কিন্তু সেখান থেকে সুকৌশলে সেই পথিক নিষ্কৃতি পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয়বদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়ে পূর্ণ রাজত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিলেন । গ্রন্থটির কলেবর ক্ষুদ্র, স্বপ্ন সফলের কাহিনীও অবিশ্বাস্য । কিন্তু এই স্বপ্ন সফলের বৃত্তান্তকে ভূদেব নিজেই উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে 'ভূদেব রচনা সম্ভার' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন'' সফল স্বপ্ন উপন্যাসের নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ সবক্তগীন । এই মুসলমান বীরপুরুষের আদর্শ চরিত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অঙ্কিত ।''[৪৪]

'সফল স্বপ্ন' কাহিনীতে অশ্বারোহী কিভাবে দস্যুদলের দ্বারা সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশের অধিপতি আলেপ্তাগীনের নিকট বিক্রীত হয়ে ধর্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ও কর্মঠ স্বভাবের দ্বারা রাজার অত্যন্ত আনুকূল্য লাভ করেন এবং মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন তারই বৈচিত্রপূর্ণ কাহিনী ভূদেব উপস্থাপিত করেছেন । অশ্বারোহী কর্তৃক নিজের জীবনের অতীত কাহিনী সম্রাটের নিকট বিবৃত করা , দাসত্বমোচন এবং প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হবার কাহিনী অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে ভূদেব বর্ণনা করেছেন । কিন্তু প্রাক্ -বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসে উপন্যাসের লক্ষণ সম্বলিত এই কাহিনীতে নর - নারীর প্রেম ও বিবাহের চিত্রটিকেও লেখক আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

জীবনে চরম বিপদ নেমে এলেও সেই হতভাগ্য অশ্বারোহীর সৌভাগ্য ফিরে এসেছিল বলেই আলেপ্তাগীনের কন্যাকে বিবাহ করবার মতো সুযোগ লাভ সম্ভব হয়েছিল । এই আলেপ্তাগীনের কন্যাকে লাভ করবার জন্যে দেশ বিদেশের

অনেক কুলীন সন্তান উপাসনা করেও রাজকন্যার হৃদয় জয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেননা রাজকন্যা কারো উপাসনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে একে একে সব বিবাহ প্রার্থীকেই বিদায় দিয়ে রাজকন্যা অনূঢ়া অবস্থায় দিনযাপন করছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে ভূদেব বলেছেন, ''রাজার অন্য অপত্য ছিলনা। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমত একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করেন ইচ্ছা করিতেন না।'[১৫]

রাজকন্যা ও প্রধানমন্ত্রী (পূর্বের অশ্বারোহী) র প্রেমাকর্ষণের চিত্রটিকে-ও ভূদেব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে রাজকার্যে সর্বদাই রাজ-বাড়ির ভেতরে যেতে হত। সেই সুযোগেই সর্বদা রাজকন্যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা সম্ভব হত। এই দেখাসাক্ষাতের সুযোগেই রাজকন্যা ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়ের সঞ্চার ঘটে এবং উভয়েই উভয়ের গুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হতে পেরেছেন এবং পারস্পরিক নৈকট্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা নর-নারীর প্রেমের আবির্ভাব এবং বিকাশকে সুন্দরভাবে বর্ণিত হতে দেখি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের কিছু-পূর্বে ভূদেবের রচনায় নর-নারীর প্রেমাকর্ষণের চিত্রটিও যে কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তা দেখানো হয়েছে। গ্রন্থকার ভূদেব বলেছেন-''আন্তরিক ভাব মাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষতঃ প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদ্গম হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি প্রফুল্ল নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবা মাত্রই পরস্পরের মন বিকশিত হইয়া উঠে এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়ন দ্বারাই মনোগত সমুদায়ভাব ব্যক্ত হইয়া যায়।''[১৬] প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজকন্যার কথোপকথনের সময়েও সেই দৃষ্টি ঝরে পড়ত এবং প্রধানমন্ত্রীরও প্রেমবিহ্বল হৃদয়ের ভাবটি প্রকাশ

পেত । রাজকুমারীর হৃদয়ের সঙ্গে এই নৈকট্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আপন হৃদয়ের ঐকান্তিক বাসনা রাজকুমারীর নিকট প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তখন আর কোন দ্বিধা নেই । প্রধানমন্ত্রী রাজকুমারীর প্রতি তাঁর হৃদয়াকর্ষণের কথা সহজেই ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন । লেখক বলেছেন - ''তিনি কি বলিলেন , এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের. চিত্ত যে কতপ্রকার রমণীয় গুণ ধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে ? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয় । অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয় , জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন এবং সর্বতোভাবে আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে । আহা ! জগদীশ্বর যে প্রীতি পদার্থকে পরম সুখের প্রধান বর্ত্ম দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্তৃক সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে ।''[১৭] প্রেমের এই যে প্রকাশ , অনুরাগের এই যে রাঙা রঙ এতো পরবর্তীকালে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পেয়েছি । কিন্তু বঙ্কিম পূর্ব রচনা হয়েও ভূদেবের কাহিনীতে প্রেমের এরূপ সুন্দর প্রকাশ দেখে আমরা অভিভূত হয়ে যাই ।

গ্রন্থকার ভূদেব প্রধানমন্ত্রী ও রাজকন্যার প্রেমের আবির্ভাব ও বিকাশকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করবার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই নর-নারী উভয়েই তাদের পারস্পরিক প্রেমানুভূতিকে অনায়াসেই ব্যক্ত করতে পেরেছেন । বিবাহের পূর্বে নর - নারীর প্রেমের চিত্র বাংলা গদ্যে এই প্রথম সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে এবং তার কৃতিত্ব গ্রন্থকার ভূদেবের । নীতিশিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা , আচার নির্দেশক প্রবন্ধ রচয়িতা হয়েও নর - নারীর প্রেমের ব্যাপারে লেখকের এই মুক্ত মানসিকতায় মানব - মানবীর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়াটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল প্রকাশের ব্যঞ্জনায় ধন্য হয়ে উঠেছে । ফলে প্রধানমন্ত্রী

যেমন নিজ হৃদয়ের ভাবটি প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি রাজকন্যাও অনুরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এই নিবিড় প্রেমাকুলতা থেকেই প্রধানমন্ত্রী রাজকন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাজকন্যাও বিবাহে সম্মত। কিন্তু প্রেম কখনো নির্বাধ নয়। প্রেমাস্পদ বা প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহের মালা পরিয়ে দিতে চাইলেও চারদিকের প্রতিবেশ তা এত সহজে সংঘটিত হতে দেয় না। প্রধানমন্ত্রী ও রাজকন্যার প্রণয়ও তেমনি বিবাহের মাধ্যমে স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যা আর কিছু নয়, কেবলমাত্র রাজকন্যার পিতার অনুমতি প্রাপ্তির সমস্যা। ভূদেব যে মুক্ত মানসিকতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাজকন্যার অনুরাগের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন বিবাহের প্রশ্নে তা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। বোধ করি সামাজিক নীতি ও আদর্শ রক্ষার প্রশ্নটি তখন ভূদেবের চিন্তায় কাজ করেছে। তাই নর-নারীর প্রেমের আবির্ভাব ও বিকাশকে যেমন আন্তরিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিবাহের বিষয়ে তাকে তিনি বাঁধন পরিয়ে দিলেন। এই কারণে রাজকন্যার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি হৃদয়াকর্ষণ, প্রণয়াবেগ স্পষ্ট হলেও বিবাহের প্রস্তাবে রাজকন্যার ঐকান্তিক সম্মতি থাকাসত্ত্বেও প্রয়োজন হল পিতার অনুমতি। তাই রাজকন্যা পিতার অনুমতি ব্যতীত এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারলেন না। কেননা তাঁর বিশ্বাস স্ত্রীলোক স্বামীর একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু স্বামীর অনুরাগিনী ও বশীভূতা হতে গেলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনও স্ত্রীলোকের আদর্শ হওয়া উচিত। ভূদেব হিন্দু ব্রাহ্মণ, কিন্তু সফল স্বপ্নের কাহিনী নির্মাণে তিনি মুসলমান নর-নারীর চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন। বিবাহের বিষয়ে হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কারকেই তিনি এখানে প্রয়োগ করে রাজকন্যাকে পিতৃ অনুমতির জন্যে অপেক্ষায় রেখেছেন। রাজকন্যার মুখে এই সামাজিক আদর্শ রক্ষার কথা তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজকন্যা প্রেমাস্পদ প্রধানমন্ত্রীকে তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, ''আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ দুঃখ ভাগিনী হইতে

অসম্মতা নহি , কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক , স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু , কিন্তু যে কামিনী অনুঢ়াবস্থায় পিতার অসম্মান করে , সে যে গৃহিনী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।''[১৮] প্রধানমন্ত্রীরও রাজকন্যার এরূপ অভিমতের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ছিল । মুসলমান হলেও বিবাহ বিষয়ে পিতামাতার অনুমতি প্রয়োজন,সেই বোধ রাজকন্যার প্রণয়-প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় । এ যেন হিন্দু সমাজের মতোই বিবাহ ব্যাপারে বর কন্যার পিতা মাতার প্রতি নির্ভরতা ও আদেশ মান্য করার চিরাচরিত রীতি । 'সফল স্বপ্নের' প্রেমিক - প্রেমিকা তা মেনে চলতে চেয়েছেন ।

ভূদেব রাজকন্যার পিতার অনুমতি লাভের জন্যে আরও একটু অগ্রসর করে নায়ক প্রধানমন্ত্রীকেই রাজার কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছেন । মিলনের ক্ষেত্রে যে বাধা উপস্থিত হয়েছে তা নিরসনের জন্যে তিনি নায়ককেই সক্রিয় করে তুলেছেন । তাই প্রধানমন্ত্রী রাজকন্যাকে বলেছেন - ''আমি এইক্ষণে রাজসন্নিধানে চলিলাম , তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব । তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে , তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া আশঙ্কা হয় ।''[১৯]একদিকে আশা ও অন্যদিকে আশঙ্কার দোলায় দুলে উঠেছে নায়কের চিত্ত । কিন্তু রাজা বিবাহে সম্মতি জানিয়ে ছিলেন । প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন''অনেক রাজপুত্র এবং কুলীন সন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন , সে কাহাকেও বরমাল্য প্রদানে সম্মতা হয় নাই আমিও এই বিষয়ে তাহার অনভিমত করিতে চাহিনা । অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে ।''[২০] রাজকন্যার সম্মতির অভাব ছিলনা । সুতরাং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হয়েছিল । প্রধানমন্ত্রী অজ্ঞাত কুলশীল , সেই কারণে এই বিবাহ দেশীয় কুলীন সমাজে আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত হয়নি , কিন্তু মন্ত্রীর

গুণাবলী দ্বারা প্রজাবর্গ তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল বলে উৎসবে মত্ত হয়েছিল। বিবাহ বিষয়ে রাজার সম্মতির বিষয়টিকেও ভূদেব অত্যন্ত সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করেছেন। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন ''যদি তুমি জেহীরার সম্মতি লাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতি-বন্ধকতা নাই, আমি এই দন্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজ গণের মধ্যে উদ্বাহসংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুণ,- যাহা হউক, এই আমার পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই।'' ২১

'সফল স্বপ্ন' কাহিনীটিতে প্রধানমন্ত্রী ও রাজকন্যার প্রেম বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলন মধুর পরিবেশ রচনা করেছে। প্রাক্ বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম কাহিনীটিতে প্রেম ও বিবাহকে এইভাবেই একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য উপন্যাসে মিলনাত্মক প্রেমের চিত্র আছে। কিন্তু পারিবারিক মান্যতার আদর্শ রক্ষার প্রয়োজনে নর-নারীর অভিভাবকদের উপর নির্ভরতার চিত্র যেমনটি ভূদেব দেখাতে পেরেছেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। উপন্যাস ধর্মী এই রচনার অন্যান্য ঘটনার ধারাকে বাদ দিলে নর-নারীর প্রেম ও বিবাহ চিত্রটি আশ্চর্য জীবনরসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। নর-নারীর হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রেম এবং সেই প্রেমের সামাজিক অনুমোদন লাভের মধ্য দিয়ে মিলন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এবং তারও পরের উপন্যাস সমূহে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ভূদেব যে সময়কালে উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তখন বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা সামান্য হলেও প্রচলিত ছিল। রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্যে কুলীন সন্তানগণের ইচ্ছা এবং ব্যর্থতার চিত্র থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে

প্রচন্ড পুরুষ প্রাধান্যের যুগেও সম্রাট আলেকজাণ্ডার বিবাহের বিষয়ে কন্যার স্বাধীন মতামতেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসলমান দুনিয়ার মহাশক্তিধর সম্রাটের কন্যার বিবাহে নিজের ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দেবার পরিবর্তে কন্যার পছন্দ অপছন্দের ওপর বিবাহ নির্ধারণ নিঃসন্দেহে এক ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। অভিজাত কুলশীল হলেও পৌরুষ এবং বীরত্বের বিচারে যে পুরুষ কন্যার পাণিগ্রহণের জন্যে উপযুক্ত, কন্যার মতের ওপর নির্ভর করে তাকে জামাতা রূপে গ্রহণ রাজার আন্তরিকতার পরিচয়কেই তুলে ধরেছে। ফলে নর-নারীর প্রেমের বিকাশের পর যে সাময়িক সমস্যা বিবাহকে কেন্দ্র করে পিতৃ আদেশ পাবার জন্যে তৈরী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তার সমাধান হয়েছে। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে প্রেম ও বিবাহই সফল স্বপ্নের বিষয়বস্তু ও কাহিনীতে যেন প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের গোড়াপত্তনের সময়ে ভূদেব এই বিশেষ দিকটিকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনী 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের যুগে প্রেম ও বিবাহ সমস্যার এ এক আশ্চর্য জীবন চিত্রায়ণ। যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ণ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন লেখক। 'ভূদেব রচনা সম্ভার' গ্রন্থে সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন-''দ্বিতীয় উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' শিবাজী ও আরংজের কন্যা রোশানারার প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত। আজ এই উপন্যাসখানির মূল্য তেমন হয়তো নাই, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অসীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা। দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) জগৎসিংহ ও আয়েষার প্রণয়-কাহিনীর চিত্রমূল শিবাজী ও রোশানারার প্রণয়-কাহিনী। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দুষিয়াছেন যে তিনি স্কটের উপন্যাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন,

কিন্তু হাতের কাছে বিদ্যমান অঙ্গুরীয় বিনিময়ের কথা কাহারও মনে পড়ে নাই কেন জানি না। শিবাজী ও জগৎসিংহের মধ্যে মিল অধিক না হইতে পারে কিন্তু রোশানারা ও আয়েষার মিল স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সেই প্রেমে অপ্রমত্ততা, প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্য সেই দুঃসহ আত্মত্যাগ, মানসিক ও কায়িক সৌন্দর্যের সেই বিচিত্র সমাবেশ, নারীদেহে পুরুষাধিক সেই বীর্য, এত মিল চোখে পড়িল না কেন তাই ভাবি।''[২২]

ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ইতিহাসের পটভূমিকাকে আশ্রয় করে লিখিত হলেও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে দেখে মনে হয় যেন এরা আমাদের চির পরিচিত বাংলার সমাজ জীবন থেকেই আহরিত নর-নারী। নর-নারীর প্রেম মানবজীবনে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ণ বঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ভারতের ইতিহাস থেকেই হোক, শান্ত কোমল সমাজ জীবনের নিরিখেই হোক, মানব - মানবীর হৃদয়াকর্ষণের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিচার করেছেন লেখক। সেক্ষেত্রে দোর্দন্ডপ্রতাপ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তনয়া রোসিনারাকে উপন্যাসের নায়িকা করতে যেমন বাধা নেই, তেমনি আওরঙ্গজেবের প্রবল প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীকেও নায়ক করতে ঔপন্যাসিকের কুন্ঠা নেই। বস্তুত বাংলা উপন্যাসে ভূদেব ইতিহাসের বহুদূর বিস্তৃত জগৎ থেকে আহরিত প্রেমকাহিনীকেই তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অবস্থানগত ভৌগোলিক ব্যবধান, ধর্মীয় পার্থক্য, জাতিগত ব্যবধান নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রেম ও বিবাহের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নর-নারীর হৃদয়ের প্রেমের বেগবান প্রবাহ সেই প্রতিবন্ধকতার বাঁধকে ভেঙে দিতে পারে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র কাহিনী নির্মাণে ভূদেব এই প্রত্যয়কেই অবলম্বন হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের উপস্থিতি উপন্যাসের কাহিনী বিস্তারে যেমন সহায়ক হয়েছে তেমনি

প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করেছে । যুদ্ধের ভয়াবহতা , মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর প্রবল শত্রুতা , সন্ধি স্থাপন এবং আওরঙ্গজেবের সন্ধির শর্তভঙ্গ পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলেছে । শিবাজী তাঁর বুদ্ধি ও অসাধারণ রণ-কৌশলে আওরঙ্গজেব তনয়া রোসিনারাকে অপহরণ করেন এবং দুর্গম পর্বতের দুর্গে প্রেরণ করেন । কিন্তু সেই দুর্গম পার্বত্য দেশে ছড়ানো প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্যময় পরিবেশকে এক স্বপ্নময় রোমান্টিক আচ্ছন্নতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে ভূদেব রোসিনারার হৃদয়ে এক অপূর্ব অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলেন । রোসিনারার মনে অপহৃতা হওয়ার বেদনা ছিল । কিন্তু এই বেদনা উপশমের অনুকূলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়েছেন লেখক । বন্দিনী হলেও প্রকৃতিরাজ্যের সেই স্বপ্নময় রোমান্টিক আচ্ছন্নতায় রোসিনারা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া দুর্গরক্ষক শিবাজীর হৃদয়ের পরম ঔদার্যে রোসিনারার অন্তঃকরণে এক আশ্চর্য ভাবমুগ্ধতার আবেশ সৃষ্টি হয়েছিল । ফলে দুর্গরক্ষকের আচরণের প্রতি রোসিনারার অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার জাগরণ ঘটে । এই শ্রদ্ধাবোধ ধীরে ধীরে রোসিনারার হৃদয় দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে । দুর্গরক্ষকের প্রতি তাঁর ভালবাসা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে । দুর্গরক্ষকের প্রকৃত পরিচয় তাঁর জানা ছিল না। কারণ শিবাজী ছদ্মবেশেই সেখানে আসতেন । কিন্তু রোসিনারা যাতে কোন অবস্থাতেই অসুখী না হন তার যাবতীয় ব্যবস্থা সেই পর্বত দুর্গে শিবাজী রেখেছিলেন । ঔপন্যাসিক ভূদেব রোসিনারার হৃদয় জয়ের জন্য শিবাজী কর্তৃক আয়োজিত দুর্গের ব্যবস্থাপনার আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে -

''দিল্লী রাজভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপকরণ শোভা সামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই । কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরও অসদ্ভাব ছিলনা । রাজভবনে হেমপাত্র - পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত , এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম

স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। শিত্রালয়ে কাশ্মীর দেশ প্রসূত শালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুকোমল রোমশ পশু-চর্মের আসন প্রসূত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ্য কিছুই দৃষ্ট হইলনা।''[২৩]

পর্বতদুর্গে আশ্রিতা রোসিনারা শত্রু কবলিত, তবু এইরূপ পরিবেশে অবস্থান করে উদ্ধারের জন্য এতটুকু চঞ্চল হয়ে ওঠেন নি। প্রবল পরাক্রমশালী পিতা নিঃসন্দেহে তাঁকে একদিন উদ্ধার করবেন এই আশাও তাঁর হৃদয়ে ছিল। কখনও মনে করেছেন অর্থলাভের জন্যই পার্বত্য দস্যুরা তাঁকে অপহরণ করে দুর্গে আবদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তাঁর প্রতি আন্তরিকতা ও উদারতার পরিচয় লাভ করে কৃতজ্ঞ চিত্তে বাদশাহের ক্রোধাগ্নি থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করবার জন্যেও আন্তরিক অভিলাষ পোষণ করেছিলেন রোসিনারা। সেই পর্বত দুর্গে ফর্দৌসী, হাফেজ, সেখসাদি পারস্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ পেয়ে রোসিনারা পাঠ করতেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে দাসীগণের নিকট জানতে চাইতেন এই গ্রন্থ সমূহ কার এবং দুর্গরক্ষকই বা কে? শিবাজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের চিত্রটিকেও লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অংকন করেছেন। কথোপকথনের সেই প্রথম সুযোগে শিবাজী তাঁর স্বভাব এবং বীর্যবত্তার পরিচয় রোসিনারার নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। রোসিনারা যখন বলেন-''আমি দিল্লীশ্বর এওরঙ্গজেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবাজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গ মধ্যে আনয়ন করিলেন?''[২৪] তখন শিবাজী উত্তরে বলেছিলেন-''আপনি বাদসাহ পুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহি এবং শিবাজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্য এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।''[২৫] তৈমুরলঙ্গ বংশজাত দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে পার্বত্য দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধনকে রোসিনারা অসঙ্গত বলে

মনে করেছেন। কিন্তু শিবাজী তার বীর্যবত্তা এবং পৌরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে রোসিনারাকে বলেছিলেন - ''আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পর্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশমর্য্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণযোগ্য হই, তাহার উত্তর এই যে তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্ত বিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন ? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবেনা, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎ প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিয়া থাকুন। কেবলমাত্র এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি। বোধ হয় কাল আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই।''[২৪]

রোসিনারার সঙ্গে বাক্যালাপের পর শিবাজী বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু শিবাজীর এই সুমধুর আত্মপরিচয়, এই হাস্যমধুর স্বভাব ও বাক্-বিনিময়ে বাদশাহ কন্যা রোসিনারার প্রতি যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দান করেছিলেন রোসিনারার মনে তা গভীর রেখাপাত করে এক মাধুর্যময় আচ্ছন্নতা এনে দিয়েছিল। রোসিনারা সেই দুর্গে বসবাসকালে শিবাজী কর্তৃক আয়োজিত যত্নপূর্ণ মাধুর্যময় পরিবেশে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন শত্রু কবলিত হয়েও নিজেকে তার এতটুকু অসুখী মনে হয়নি।

তাছাড়া সেই দুর্গমধ্যে রোসিনারা যখন যা অভিলাষ করতেন তা পেতে কোন অসুবিধাই তাঁর হয়নি। ভূদেব সেই আন্তরিকতার পরিবেশটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেছেন''বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্র-পতি প্রত্যহ এক একবার করিয়া তাহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদয় পুনঃপুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহ পুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীরপুরুষের সহিত মিলিত জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন।''[২৭] শিবাজী শত্রু তনয়া রোসিনারাকে অপহরণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে অধিকার করার কোন উদ্দেশ্য শিবাজীর হৃদয়ে প্রথমে ছিলনা, শত্রু দ্রোহিতার কারণেই আওরঙ্গজেবকে সমুচিত জবাব দিতে তা করেছিলেন। রোসিনারাকে পূর্বে শিবাজী কখনও দেখেন নি। তাঁর প্রতি পূর্বের কোন আকর্ষণের কারণই এই অপহরণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলনা। কিন্তু দুর্গে অবস্থিতা রোসিনারার সঙ্গে প্রতিদিনের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিবাজীর হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে অনুরাগের সঞ্চার ঘটে এবং এই কারণে তিনিও রোসিনারার হৃদয়কে দ্রুত আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোসিনারার প্রতি শিবাজীর প্রণয় প্রকাশের ব্যাপারে গ্রন্থকার ভূদেব যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তা আশ্চর্য শিল্পমন্ডিত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার বলেছেন''তিনি অদৃষ্ট-পূর্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতি সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত বাটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্য্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তাদ্বারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা

সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদান কেবল বদান্যতা হইতে জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানা কার্য্য-ব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময়দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাব সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই।''[২৮]

বস্তুত, শিবাজীর আন্তরিক ব্যবহারের জন্যই রোসিনারার হৃদয় জয় সম্ভব হয়েছিল। শিবাজী তাঁর প্রতিদিনের জীবনের মন্ত্রণা ও কার্য্যসমূহ তাঁর কাছে তুলে ধরে নতুন কর্মপদ্ধতি স্থির করে যেতেন। এর ফলে বাদশাহ তনয়া রোসিনারা নিজেকে শিবাজীর একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং প্রীতিভাজন মনে করে প্রবল হৃদয়াকর্ষণ অনুভব করতেন। এর সঙ্গে আরেকটি ঘটনাযুক্ত হয়ে শিবাজীর প্রতি রোসিনারার প্রণয় গভীরতর হয়েছে। প্রতিদিন পর্বতের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে অভ্যস্ত শিবাজীর এক সেনাপতি রোসিনারার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে প্রণয় নিবেদনের জন্যে বাসনা ব্যক্ত করলে রোসিনারা তাকে তিরস্কৃত করেন এবং সেনানী বাদশাহ কন্যার প্রতি কটূক্তি করেন। শিবাজী রোসিনারার নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনে সেই সেনানীকে সমুচিত শাস্তি দিতে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিলেন। প্রচন্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হলেও সেনানীর দারুণ প্রহারে মহারাষ্ট্রপতির জীবন বিপন্ন হয়েছিল। আহত শিবাজীর এই দুরবস্থায় রোসিনারা উদ্বিগ্নমনা হয়ে পরিচারিকাসহ সেবায় নিযুক্ত হন। শিবাজীর শয্যার পাশে বসে রোসিনারা শিবাজীর মাথায় তার কোমল হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। অসুস্থ দুর্বল শিবাজী রোসিনারার এই সেবাকে পরম সুখে উপভোগ করেন। সেই দুর্বল মুহূর্তে রোসিনারার উপস্থিতি ও সযত্ন সেবায় মুগ্ধ শিবাজীর হৃদয় থেকে উৎসারিত আবেগপূর্ণ ভাষায় আছে অনুরাগের স্পর্শ। শিবাজী বলেছেন ''শত্রু ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শতশত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়।'' রোসিনারা লজ্জানম্র হয়ে নিজেকেই অনর্থের মূল বিবেচনা করেছিলেন।[২৯] তাই

''মহারাষ্ট্র-পতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্য্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব।''[৩০] রোসিনারার হৃদয়ে স্ত্রী জাতির যে সাধারণ গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেই গুণের অভাব ছিলনা। তাই প্রিয়জনের দুঃখে তাঁর কাতরতা অসীম। ভূদেব বলেছেন - ''দেখ বাদশাহপুত্রী রোসিনারা কখনও কাহারও সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্বইচ্ছায় শিবাজীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবাজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটি অধিক লাভ হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করত তাঁহার সহিত মিলিত মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণ খন্ড দুয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধ সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটি পারস্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন, ''গুরুজনের অসম্মত কর্ম্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়েই সুখী হই।''[৩১] এ যেন 'সফল স্বপ্নের' মতোই প্রণয় প্রার্থী রাজকন্যা ও প্রধানমন্ত্রীর বিবাহে রাজকন্যার পিতার নিকট সম্মতি লাভের বিষয় হয়ে উঠেছে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' দুই নর-নারীর প্রণয়ের অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্যে উপন্যাসে যতটা আয়োজন করা দরকার তা সুন্দরভাবেই ঔপন্যাসিক ভূদেব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু প্রেম সব সময় নির্বাধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনা। মানব-মানবীর প্রেমের পথে এসে দাঁড়ায় বাধা। কখনও সে বাধা সামাজিক, কখনও বা পারিবারিক। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' দুই অসম বংশীয় নর-নারীর প্রণয়-কাহিনী। কিন্তু শুধু প্রণয় বিকাশের ঘটনার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকেনি।

দুটি নর-নারী হৃদয়ের মেলবন্ধনের পর অপেক্ষমান ছিল বিবাহের জন্য। কিন্তু বিবাহ একটি পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যাপার। তাতে পারিবারিক রীতি-নীতির মান্যতার প্রশ্ন এসে যায়। এই কারণেই প্রণয়িনী রোসিনারা গুরুজনের সম্মতি প্রাপ্তির বিষয়টিকে উপস্থাপিত করে বিবাহে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু পিতার অনুমতি প্রাপ্তি দূরে রইল। নূতন করে আর এক বাধার সম্মুখীন হতে হল শিবাজীকে। যে সেনানীকে প্রচন্ড আঘাত করে শিবাজী মনে করেছিলেন যে সে নিহত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিহত হয়নি। পরবর্তীতে তারই বিশ্বাসঘাতকতায় আওরঙ্গজেবের মুসলমান সেনানী শিবাজীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেন ও দুর্গ অধিকার করেন। শিবাজী কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। বিপন্ন শিবাজী পলায়নের পূর্বে রোসিনারাকে অভয় দান করে বলেছিলেন, ''তোমার পিতৃ সৈন্য আমার দুর্গ অধিকার করিল - তোমার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব।''[৩২] উত্তরে রোসিনারা বেদনাভরা চিত্তে বলেছিলেন''যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখনও যদি পুনর্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও।''[৩৩] বিপদের মুখে পড়ে শিবাজী যেমন প্রিয়তমা রোসিনারাকে অভয় দান করেছেন, ধৃত হলে রোসিনারার পিতৃসৈন্য কর্তৃক মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রোসিনারাকে সামান্য দোষ দেননি তেমনি রোসিনারাও ঘোর বিপদের মধ্যে প্রিয়তমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে পলায়নের পরামর্শ দিয়েছেন এবং পুনরায় মিলিত হওয়ার বাসনা পোষণ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শিবাজীর নিকট সমর্পণ করার কথা ব্যক্ত করেছেন। এই তো প্রেম, এই তো হৃদয়াকর্ষণের সার্থক প্রকাশ।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' প্রেমের অবাধ গতিকে প্রতিকূল পরিবেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে। পরবর্তীতে পিতা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রোসিনারার মুখে শিবাজীর গুণকীর্তন শুনে আওরঙ্গজেব সন্তুষ্ট তো হলেনই না বরং শিবাজীর প্রতি তাঁর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। রোসিনারাকেও এজন্যে শাস্তি পেতে হল। আওরঙ্গজেবের বৃদ্ধ পিতা সাজাহানের সঙ্গে রোসিনারাকে কারাবাসিনী হতে হল। শিবাজী পুনরায় আবির্ভূত হয়ে দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তখন ঐ বিশ্বাসঘাতক সেনানীই শিবাজীকে সাহায্য করেছিল। আর রামদাস স্বামী তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিলেন। শিবাজী মোগলের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আওরঙ্গজেবের মিত্র জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ সাক্ষাতের মুহূর্তে শিবাজীকে নজরবন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করেন। রোসিনারা রইলেন কারাগারে, শিবাজী নজরবন্দী। কিন্তু কারাগারবাসিনী রোসিনারার হৃদয়ে শিবাজীর প্রতি আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন, পিতার তিনি প্রিয় কন্যা ছিলেন। আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে তাঁর দিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। দুঃখের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কোনদিন তাঁকে হতে হয়নি। কারাগারে সাজাহানের সহচরী হয়ে রোসিনারা তাঁর বেদনা ভুলে ছিলেন কেবলমাত্র শিবাজীর চরিত্রের ঔদার্য এবং অনুরাগের মধুর স্মৃতিতে আচ্ছন্ন থেকে। গ্রন্থকার বলেছেন''শিবাজী বাক্য দ্বারা কখনও রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই ৩৪ প্রতি প্রণয়বদ্ধা বাদশাহ-পুত্রী তাদৃশ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।'' তাই রোসিনারা শিবাজীর জন্য জীবনের সকল সুখ পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

রোসিনারার প্রতি শিবাজীর প্রণয়াবেগও ছিল দুর্বার, কিন্তু তাঁর সেই প্রণয়াবেগ রোসিনারার পিতা আওরঙ্গজেবের কূটকৌশলের শিকার হয়ে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে রোসিনারাও পিতার এই প্রবল বিরোধিতায় নিরুপায় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়েছেন। ইন্দ্রিয় সুখ তাঁর কাছে বড় নয়, বড় হল হৃদয়ের প্রেম। এই প্রেমের জন্য সে তো প্রস্তুত ছিলনা। অদৃষ্টই তাঁকে এই প্রেমের স্পর্শ দিয়েছে। প্রেমের জন্যই তিনি দুঃখবরণ করে নিয়েছেন। শিবাজীর প্রতি তাঁর হৃদয়ের ঐকান্তিক ভালবাসা কারাগারে বন্দী পিতামহ সাজাহানের সঙ্গে বাক্যালাপের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। কারাগারে শিবাজীর প্রসঙ্গ বর্ণনাতেই যেন রোসিনারা দুঃখের ভার লাঘব করতে চেয়েছেন। পিতামহর কাছ থেকে শিবাজী সম্বন্ধীয় বিবরণ রোসিনারার কাছে অধিকতর আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। শিবাজী মুসলমান সেনাপতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছেন জেনে সন্ধির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রোসিনারা অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীও রোসিনারার জন্যে প্রাণ দান করতে প্রস্তুত। কিন্তু রোসিনারাকে পাওয়ার লোভে তিনি নিজ কর্তব্য সাধনের পথ থেকে সরে আসতেও পারেন না। আওরঙ্গজেবের বন্ধু জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে শিবাজী হীনবল হয়েছিলেন বলে রোসিনারাও ভীত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন পিতামহের নিকট শুনেছেন যে শিবাজী আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করে জয়সিংহের সাহায্যে বিজয়পুরের বিপরীতদিকে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর হৃদয়ের নির্জীব আশালতা পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছিল। আওরঙ্গজেব যখন শিবাজীকে অভয় দিয়ে নিজ সভায় উপস্থিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন তখনও রোসিনারার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পিতার নিষ্ঠুর স্বভাবের কথা জানতেন বলে শঙ্কিতও হয়েছিলেন তিনি। তারপর দিল্লীশ্বরের সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাতের সময় সাজাহানের পরামর্শে ব্যাকুল রোসিনারা আড়ালে থেকে শিবাজীকে দেখেছেন। কিন্তু শিবাজীকে বিমর্ষ

দেখে তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। আওরঙ্গজেব সেই সন্দেহকেই সত্য করে তুলেছেন। শিবাজী নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন এবং রোসিনারাকে উদ্ধারের জন্যে চেষ্টা করেছেন। রোসিনারা পিতার জন্মদিনে আমোদ প্রমোদে অংশগ্রহণের জন্যে এসেছিলেন, কিন্তু পিতার অধর্ম মতির কথা বুঝে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। শিবাজী পলায়ন-কালে তাঁর হাতের অঙ্গুরীয় এক বার পোষার সাহায্যে রোসিনারার নিকট প্রেরণ করেন। রোসিনারা সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শিবাজীর কথা ভেবে তাঁর হৃদয় ব্যাকুলতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। শিবাজীর কথামতো রোসিনারা তাঁর সাথে পলায়ন করতে পারতেন। পিতামহ সাজাহানও তাঁকে ছদ্মবেশে পলায়নের পরামর্শ দিয়েছেন। শিবাজীও চেয়েছিলেন রোসিনারা যেন নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে প্রস্থান করেন। কিন্তু রোসিনারার হৃদয়ে তখন প্রবল দ্বন্দ্ব। একদিকে প্রেমাস্পদ শিবাজীর প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণে তাঁর হৃদয় তীব্র প্রণয়াবেগে প্লাবিত, অন্যদিকে পিতার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ-এ দুটির মধ্যে কোনটিকে তিনি বেছে নেবেন স্থির করতে পারছিলেন না। রোসিনারার হৃদয়ের এই দোদুল্যমানতার চিত্রটি লেখক সুস্পষ্টতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন এইভাবে-''এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ? - অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে - ইহার সঙ্গেই দাসী বেশে প্রস্থান করি - কিন্তু তাহা কি উচিত হয়, পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন - কিন্তু সেইজন্য কি আমিও অন্যথাচরণ করিব ? না, আমার যাওয়া হইবেনা - ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি ?''[৩৫] কিন্তু সাজাহান তাঁকে পলায়নে উৎসাহিত করলেও রোসিনারা পিতামহ প্রদত্ত ছদ্ম-বেশী দাসীর পোশাক হাতে তুলে নিয়েও রেখে দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হৃদয় তখন যাওয়া না যাওয়ার ঔচিত্য বোধে দ্বিধান্বিত। এ প্রসঙ্গে সাজাহানের উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান ''কি সে অনুচিত ? - যে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বন্ধ

হইয়াছে বলিয়াই এ পর্য্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, সে হিন্দু তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন কি সুখে আছ যে যাইতে অনিচ্ছা হয়?''[৩৬]

রোসিনারার হৃদয়ে পলায়নের ইচ্ছা ছিল দুর্বার। শিবাজীর প্রতি প্রণয়ের গভীরতাই তাঁকে পালাতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু একমাত্র বাধা ছিল পিতার প্রতি অবাধ্যতা। শিবাজীর প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা পরিসীমা নেই। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা - সেও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।তাই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন -''যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্বক তাঁহার বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েতা বিরুদ্ধ হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না।''[৩৭]প্রেমের আবেগের সঙ্গে এইখানেই রোসিনারার আদর্শের দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বে প্রেমাবেগকে তিনি নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না, আবার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারেন না। সাজাহানকে তাই তিনি বলেছিলেন,''কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবাজীর শত্রু করা হইবে,সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিব?''[৩৮] রোসিনারা যেতে পারলেন না, কিন্তু প্রণয়ের নিদর্শন হিসেবে তাঁর হাতের অঙ্গুরীয়টি বারপোষাকে দিয়ে শিবাজীর জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনিও মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তীব্র মনোবেদনায় ও বিরহতাপে দগ্ধ হয়ে রোসিনারা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। পিতা আওরঙ্গজেব তাঁর দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করে তাঁকেই দোষী করেন। পারস্যরাজের পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন আওরঙ্গজেব। শিবাজীকে হত্যা করতে চেয়ে রোসিনারাকে শাস্তি দান করতে চেয়েছেন।

উপন্যাসে রোসিনারা নিজের জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়ে পারস্যরাজের পুত্রের সঙ্গেই তার বিবাহ পিতার মত অনুযায়ী মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কেবল প্রণয়াস্পদ প্রিয়তম শিবাজীর প্রাণ রক্ষার তাগিদে। শিবাজীর প্রতি তাঁর প্রণয়ের বেগ এতই তীব্র যে সারা জীবন ধরে দুঃসহ দুঃখ দহনে দগ্ধ হতেও তিনি রাজী, কিন্তু প্রিয়তম শিবাজীর মৃত্যুকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তাই আওরঙ্গজেবের মুখে উচ্চারিত ভীষণ কথাটি- ''আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে''[৩১] শুনে রোসিনারা মূর্ছিতা হয়েছিলেন।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' প্রণয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব ও বিকাশের চিত্র স্পষ্ট, কিন্তু এই প্রেম শেষ পর্যন্ত বিবাহের বন্ধনের মাধ্যমে মিলনের পরিবেশ রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু হৃদয় রাজ্যে শিবাজী ও রোসিনারা এই দুই নর-নারী দুজনেই মনে মনে বিবাহিত। বাস্তবে পিতার বিরোধিতা, সামাজিক ব্যবধান, জাতিগত বৈষম্য সকল বাধা একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে রোসিনারাকে আর অগ্রসর হতে দেয়নি। এখানে হৃদয়ের ধর্ম প্রতিকূলতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ী হতে পারে নি। তাই পত্র এবং অঙ্গুরীয় প্রদান করে রোসিনারা তাঁর প্রণয়াস্পদ শিবাজীকে অসামর্থের কথা জানিয়ে ছিলেন। অন্যদিকে শিবাজী চেয়েছিলেন রাজ্যসুখও যদি বিসর্জন দিতে হয় তাকেও দেবেন। রোসিনারাকে লাভ করতে পারলে সেই হত তার সবচেয়ে বড় সুখ। রাজ্য সুখ তার চেয়ে বড় নয়। শিবাজী রোসিনারার নিকট প্রত্যাখ্যাত হননি, কিন্তু সমাজবিধানের প্রতি আনুগত্য, পিতার আদেশ এইসব একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের বিবাহের অনুকূল বাস্তব পরিবেশকে ভেঙে খান খান করে দেয়। বাস্তবে যে বিবাহ সম্ভব হয়নি, হৃদয়-রাজ্যে কিন্তু তাঁদের সেই বিবাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। প্রেমের কাঙ্গাল শিবাজী রোসিনারার প্রতি সুগভীর আকর্ষণে কি না করেছেন!

যুদ্ধ করেছেন নিজ সেনানীর সঙ্গে, গুরুতর আহত হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছেন ও রোসিনারার জন্যেই যুদ্ধ করেছেন পরাক্রমশালী আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলের সঙ্গে এবং এমন কি রোসিনারাকে পাওয়ার বাসনায় সন্ধি পর্যন্ত করেছেন আওরঙ্গজেবের সঙ্গে। আওরঙ্গজেব সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন। রোসিনারাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছেন, শিবাজীকে নজরবন্দী করে রেখেছেন তবুও আওরঙ্গজেব তনয়া রোসিনারাকে ভালবেসে গেছেন শিবাজী। তাঁকে বিবাহ করে সুখী হতে চেয়েছেন। রোসিনারা মুসলমান, শত্রু তনয়া তবু কোন বাধাই শিবাজীকে বিরত করতে পারেনি। সংস্কারবিহীন মুক্ত হৃদয় নিয়ে রোসিনারার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসা নিবেদন করেছেন। তাঁর প্রেম বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলনের পরিবেশ রচনা করেনি ঠিকই। কিন্তু দেহ-গন্ধবিহীন এই প্রেম 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'কে প্রেমের কাহিনী হিসেবে সার্থক করে তুলেছে। রোসিনারাকে পাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয় একথা জেনে রোসিনারার পত্র ও অঙ্গুরীয় গ্রহণ কালে শিবাজীর ভাষায় যে বেদনার সুর ধরা পড়েছে তা গ্রন্থকার ভূদেব আশ্চর্য ভাবে বর্ণনা করেছেন - ''রোসিনারা অন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন - যদি তাহার নিমিত্ত আমার রাজ্য-বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম - তাদৃশ সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্যবাসেও অসুখ নাই।''[৪০] এতখানি আত্মত্যাগ এত বড় বীরের পক্ষে সম্ভব হলেও রোসিনারার মতো নারী পারেনি তাঁকে গ্রহণ করতে। প্রেমাস্পদ হিসেবে তাঁকে রোসিনারা হৃদয় রাজ্যে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহ করতে পারলেন না। কিন্তু এই রোসিনারা যে সামান্যা স্ত্রীলোক নন স্বয়ং রামদাস-স্বামীই তা শিবাজীকে বলেছেন - ''বাদশাহ পুত্রীর যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন এবং তুমি সেই জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ।''[৪১]

রোসিনারা নিজেকে স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছে কিন্তু এই বঞ্চনা তীব্র হৃদয় বেদনায় তাঁকে দগ্ধ করেছে। উপন্যাসের শেষে ভূদেব তাঁর সেই বেদনার্তিকেই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রোসিনারা শিবাজীকে বলেছেন - ''হে মহারাষ্ট্র রাজ! হে প্রিয়তম! - আমি কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব - আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিনা। - তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না - কিন্তু আমি তোমার মন জানি। অতএব আমি যে জন্য তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রতি অক্রোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব - তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম - অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল। - কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহরিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে - এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী - সহবাস সুখে বঞ্চিত করিলাম - যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না - সেকথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই - কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে। - অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও প্রজাতি - বাৎসল্য প্রযুক্ত নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিবে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই - একান্ত অধীনা রোসিনারা।''[৪২] বাস্তবে বিবাহ সম্ভব হল না ঠিকই, কিন্তু রোসিনারার নিকট শিবাজীই স্বামী। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সেই সত্যটিকেই রোসিনারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এইভাবেই প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' শিবাজী ও রোসিনারার প্রেম ও বিবাহ সমস্যাকে চিত্রিত করে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে।

প্রাক্ - বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা আলোচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্থান নির্ণয়ের পর এসে যায় প্যারীচাঁদমিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের কথা । যদিও উপন্যাস হিসেবে এই গ্রন্থটিকে সাহিত্য সমালোচকেরা গণ্য করেননি তবুও বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তনের কাজে এটি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই । প্যারীচাঁদ মিত্র নিজে অবশ্য এটিকে উপন্যাসই বলেছেন । সে যাই হোক - আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রেম ও বিবাহের সমস্যা চিত্রণ । সেই নিরিখেই গ্রন্থটির অবদান আমাদের বিচার্য বিষয় । 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রী: । তার পূর্বে কাহিনী ধর্মী আরও কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু এ সব গ্রন্থের মধ্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রেম ও বিবাহ সমস্যা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কাহিনীতে যতটা উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা দিয়েছে আর কারও লেখায় অন্তত প্রাক্ - বঙ্কিম যুগে ততটা বলিষ্ঠতা নিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেনি ।

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের PREFACE অংশে প্রাপ্ত লেখা থেকে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় । সেখানে বলা হয়েছে - "The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the Public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu Society, manners, customs," [৪৩] সন্তানদের উপযুক্তভাবে গড়ে না তোলার বিষময় ফল , বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব , নীতিহীনতা, ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রভৃতিকে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেই গ্রন্থটির প্রকাশ । বিখ্যাত

ভাষাতত্ত্ববিদ জন বীমস (John Beames) বলেছেন , "Babu Peari Chand Mitra, who writes under the nom de plume of Tekchand Thakur, has produced the best novel in the language, the Allaler Gharer Dulal, or "The Spoilt child of the House of Allal." He has had many imitators, and certainly stands high as a novelist; his story might fairly claim to be ranked with some of the best comic novels to our own language for wit, spirit and clever touches of nature" [৪৪] 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস সম্পাদনা কল্পে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বলেছেন- ''আলালের ঘরের দুলালের' ও মূল উদ্দেশ্য নীতি শিক্ষা দান । সামাজিক রীতিনীতি এবং বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইলেও সমগ্র গল্পটি একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে সহজভাবে প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা উপন্যাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে - গ্রন্থকারের নীতি বিষয়ক মন্তব্যগুলি মাঝে মাঝে উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে ব্যাহত করিলেও একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই । তাঁহার অপূর্ব পর্য্যবেক্ষণ শক্তির গুণে ব্যঙ্গ ও উপদেশের আবরণ ভেদ করিয়া একটি বাস্তবধর্মী গল্প পাঠককে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া চলে । এই আকর্ষণী শক্তিই প্যারীচাঁদের মৌলিকতা ।''[৪৫]

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে বর্ণিত বিষয় হল বৈষয়িকজ্ঞানসম্পন্ন বাবুরামবাবুর প্রকৃত শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা ও নিজের নৈতিকতার অভাবে বড় ছেলে মতিলালের অধঃপতন । কলকাতায় স্কুলে পড়াশুনার সময় কুসঙ্গে পড়ে মতিলালের জুয়াখেলা , মারামারি , গ্রেপ্তার , ঠক চাচার মিথ্যে সাক্ষ্যের দ্বারা মুক্তি , ভদ্রঘরের বিবাহিতা মেয়ের প্রতি অত্যাচার, মায়ের বাধা দান , মতিলালের বিবাহ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে । এছাড়া বাবুরামবাবুর মৃত্যু, মতিলালের

বাবুয়ানা , নিজের স্ত্রীকে অত্যাচার , ছোট ভাই , রামলালের প্রতি দুর্ব্যবহার , রামলালের বিদেশ গমন , মতিলালের ব্যবসা , ঋণগ্রস্ততার চিত্র এবং বৈদ্যবাটীতে পলায়ন , মা ও স্ত্রীকে বিতাড়ন , দেশ ভ্রমণ , ঈশ্বর বিশ্বাস এবং চিত্তশুদ্ধি এত সব ঘটনাকে জুড়ে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন লেখক । এর সঙ্গে মিশেছে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ , বাবুরামের বিধবা কন্যা মোক্ষদা ও দ্বিতীয়া কন্যা প্রমদার দুঃখময় জীবনের কাহিনী , ঠক চাচার প্রসঙ্গ প্রভৃতি ।

উপন্যাসের সব লক্ষণ 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে না থাকলেও সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ণ ঘটেছে নানাভাবে । প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছে নর - নারীর বিবাহের বিষয়টি । কিন্তু প্রেমের চিত্র উপন্যাসে মোটেই নেই । কতগুলি বিবাহের প্রসঙ্গ উপন্যাসের অঙ্গ জুড়ে ছড়ানো রয়েছে । গ্রন্থটির রচনা-কালের যে সমাজ জীবন লক্ষ্য করা যায় তা থেকে অবশ্য বিবাহ প্রসঙ্গ কিংবা অন্যান্য সমাজ চিত্র আহরিত হয়নি । কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের সমাজ জীবন থেকে আহরিত উপাদান নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়নি । গ্রন্থের সম্পাদনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস বলেছেন - ''উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশ নূতন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে , হিন্দু কলেজে - শিক্ষিত ''ইয়ং - বেঙ্গল'' দল সমাজের দিকে দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 'আলালের' কাল আরও পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে গল্পের সূচনা ।''[৪৬] তখন পণপ্রথা , কৌলীন্য প্রথা বিভীষিকা হয়ে বাংলার সমাজ জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে জাঁকিয়ে বসেছিল । বিধবাবিবাহ বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র আইনসিদ্ধ হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করবার মতো মুক্ত মানসিকতা বাংলার সমাজ জীবনে দেখা যায়নি । ফলে নারীদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা ছিলনা । পুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহ এবং বহু বিবাহ করতেন । অনেকেই বহু বিবাহ করে দাম্পত্য জীবনকে বিষময় করে তুলেছিলেন । বাল্যবিবাহও সমাজে প্রচলিত ছিল ।

বাল্যবিবাহের ফলে নারী জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্ভাগ্য । বৈধব্যের আঘাত নেমে এসে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের সুখ কেড়ে নিয়েছে ।বিবাহ নর - নারীর জীবনে দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ ঘটায় - এটাই পরবর্তীকালের উপন্যাসে , সাহিত্যে ফুটে উঠেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত দাম্পত্য জীবনে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে । কিন্তু তার পূর্ববর্তী উপন্যাস চর্চায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' যে দাম্পত্য চিত্রকে তুলে ধরেছে তাতে প্রেমের বিকাশ ঘটেনি । বিবাহের পূর্বে বা পরে নর - নারীর প্রণয়ের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষণীয় বিষয় । কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে' সে রকম কোন চিত্র নেই । বিবাহের পরেও এখানে দাম্পত্য প্রেম নর - নারীর জীবনকে মধুময় করে তোলার অবকাশ খুঁজে পায়নি । বরং প্রেমবিহীন এক কঠিন বিবাহিত জীবনই সেখানে ছড়িয়ে আছে ।

উপন্যাসে বাবুরামবাবুর সম্পর্কে কেবলমাত্র জানা যায় যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন । লেখক এ বিষয়ে বলেছেন - ''আপনার স্ত্রীকে বড়ো ভালবাসিতেন , স্ত্রী যাহা বলিতেন সেই কথাই কথা - স্ত্রী যদি বলিতেন এ জল নয় - দুধ , তবে চোখে দেখিলেও বলিতেন তাইতো এ জল নয় - এ দুধ- না হলে গৃহিনী কেন বলবেন ?''[৪৭] বাবুরামবাবুর পত্নী -প্রেম তীব্র ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন - ''অন্যান্য লোকে আপন আপন পত্নীকে ভালবাসে বটে , কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিতে পারে যে স্ত্রীর কথা কোন কোন বিষয়ে ও কতদূর পর্য্যন্ত শুনা উচিত । সুপুরুষ আপন পত্নীকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসে কিন্তু স্ত্রীর সকল কথা শুনিতে গেলে পুরুষকে শাড়ী পরিয়া বাটির ভিতর থাকা উচিত । বাবুরামবাবুর স্ত্রী উঠ বলিলে উঠিতেন - বস বলিলে বসিতেন ।''[৪৮] সে দিনের বাবু সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় বাবুরাম বাবুর পত্নী -প্রেমের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছে ।

কোন প্রেমিক - প্রেমিকার ভালবাসার চিত্র উপন্যাসে নেই। নর - নারীর হৃদয়াকর্ষণের বিষয়টিও উপন্যাসে পুরোপুরি উপেক্ষিত থেকেছে। আসলে নর - নারীর হৃদয়োত্থিত প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশ 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে নেই। এ এক সমাজ চিত্র। সেই সমাজ চিত্র ফুটিয়ে তুলতে বাংলাদেশের মেয়েদের জীবনের কান্নাকে লেখক মাঝে মাঝে উপন্যাসের অঙ্গীভূত করেছেন। তখনকার বাংলার সমাজ জীবনে বিবাহিতা নারীদের কষ্টের অন্ত ছিলনা। স্বামীর কাছ থেকে প্রেমের প্রত্যাশা তাদের বৃথা। পরিবর্তে তারা কেবলই পেয়েছে উপেক্ষা আর বঞ্চনা। মেয়েদের কথোপকথনের মাধ্যমে সেই চিত্রটি ধরা দেয় - '' মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে, বাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল - কেহ বলে, আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাটকি - কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই - বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়া থেৎলায় - বেটা কিছুই বলে না, ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে - কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়ে - ছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল - কবে মরি কবে বাঁচি এই বেলা তার বিয়েটি দিয়ে নি।''[৪১] এই তো বিবাহিত জীবনের চিত্র। নর - নারী বিবাহের পর ঘর - সংসার করেছেন ঠিকই, কিন্তু পুরুষদের চরম ঔদাসীন্যে নারী জীবনে প্রেমের প্রত্যাশা মিছে হয়ে গেছে।

কৌলীন্য প্রথার প্রচলনের ফলে বাংলার সমাজ জীবনে যে বিবাহ রীতি চালু হয়েছিল তখনও সেই প্রভাব বাংলাদেশে ছিল। প্যারীচাঁদ তারই বেদনাময় অভিজ্ঞতার কথা মোক্ষদা ও প্রমদার বাক্যালাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের কথায় বিবাহিত জীবনে বঞ্চনার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলাতে প্রমদার বিবাহ হয়েছে। তার পিতা এক কুলীন ছেলেকে ধরে এনে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। বড় হয়ে প্রমদা একথা জানতে পেরেছে।

কিন্তু তার স্বামী আবার শত স্থানে বিবাহ করেছে। তাই স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে প্রফুল্লদা কটূক্তি করতে দ্বিধা করেনি, এমনকি তার মুখ দর্শন করতেও তার ইচ্ছে হয়নি। গভীর দুঃখ ও বঞ্চনা থেকেই প্রমদার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে বেদনার ভাষা - 'অমন স্বামী না থাকা ভালো।' যে স্বামী দাম্পত্য-জীবনের অংশীদার হয় না, স্ত্রীকে প্রেম দানের পরিবর্তে বহু বিবাহ করে অধঃপতনের খাদে নেমে আসে, তার মুখ দর্শন করা কোন স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সেদিনের বিবাহিতা রমণীর সমস্যাকে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসে মোক্ষদা একজন বিধবা নারী। বিবাহিত জীবনে সুখ তারও ভাগ্যে আসেনি। তবু হিন্দু নারী হিসেবে সে বিশ্বাস করে' 'স্বামী মন্দ হউক ছন্দ হউক, মেয়ে মানুষের এয়ত্ থাকা ভাল।''[৫০] প্রমদা এয়ত্ হতে পারে, কিন্তু যে স্বামী তাকে বিবাহ করে বিপদের দিনেও প্রতারণা করে, যা কিছু সহায় সম্পদ আছে সব কেঁড়ে নিয়ে যায় তার মতো স্বামী দিয়ে প্রমদা কি করবে! প্রমদাকে তাই বলতে শোনা যায় - ''আর বৎসর যখন আমি পালা জ্বরে ভুগতেছিনু - দিবারাত্রি বিছানায় পড়ে থাকতুম - উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা, সে সময় স্বামী আসিয়া উপস্থিত হলেন। স্বামী কেমন, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখি নাই, মেয়ে মানুষের স্বামীর ন্যায় ধন নাই। মনে করিলাম দুই দন্ড কাছে বসে কথা কহিলে রোগের যন্ত্রণা কম হবে। দিদি বললে প্রত্যয় যাবেনা - তিনি আমাকে কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বল্লেন - ষোলো বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি - তুমি আমার এক স্ত্রী - টাকার দরকারে তোমার নিকট আসিতেছি শীঘ্র যাব - তোমার বাপকে বললাম। তিনি তো ফাঁকি দিলেন - তোমার হাতের গহণা খুলিয়া দাও। আমি বললাম মাকে জিজ্ঞাসা করি - মা যা বলবেন তাই করবো। এই কথা শুনিবা মাত্র আমার হাতের বালা-গাছটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত বাগড়া বাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা

লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন - তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু , তারপর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষন বাতাস করাতে আমার চেতনা হয় ।''[৫১] এই তো নর - নারীর বিবাহের পরিণতি । এথেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম তো দূরের কথা স্ত্রীর প্রতি সামান্য কর্তব্য পালনও তখন বিবাহিত পুরুষ করেন নি । বহু বিবাহ প্রবর্তিত বাংলার সমাজ জীবনের এই সমস্যাটিকে প্যারীচাঁদ বঙ্কিম পূর্বকালের উপন্যাস রচনার প্রয়াসের মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন । এই কারণে প্রমদার মতো বিবাহিতা নারীর স্বামী থাকা না থাকা দুই-ই সমান হয়েছে ।

বিবাহ উপলক্ষে তখনও পনের প্রচলন ছিল । ছেলের বিবাহ কাল উপস্থিত হলে পনের টাকা প্রাপ্তির জন্যে পিতার লোভ ছিল সেদিনের প্রচলিত অভ্যাস । বেচারামবাবু বাবুরামবাবুকে মতিলালের বিবাহ সম্বন্ধে জানতে চাইলে বাবুরাম-বাবু বলেছিলেন' 'সম্বন্ধ অনেক আসিয়াছিল । গুপ্তিপাড়ার হরিদাস-বাবু , নাকসীপাড়ার শ্যামাচরণ বাবু , কাঁচরাপাড়ার রামহরি-বাবুও ও অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক ব্যক্তি সম্বন্ধের কথা উপস্থিত করিয়াছিল । সে সব ত্যাগ করিয়া এক্ষনে মল্লিকপুরের মাধববাবুর কন্যার সহিত বিবাহ ধার্য করা গিয়াছে । মাধববাবু যোগ্রাপন্ন লোক আর আমাদিগের দশ টাকা পাওয়া খোয়া হইতে পারিবে ।' [৫২] বিবাহ উপলক্ষে অর্থপ্রাপ্তির এই লোভকে ব্যঙ্গ করতে প্যারীচাঁদ বেচারাম বাবুর বক্তব্যকে ব্যবহার করেছেন -

''বাবুরামবাবু ! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ ? টাকার লোভেই গেলে যে ! তোমাকে কি বলব ? - এ আমাদিগের জেতের দোষ । বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে - কেমন গো রূপোর ঘড়া দেবে তো ? মুক্তোর মালা দেবে তো ? আরে আবেগের বেটা কুটুম

ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ - মেয়ে ভালো কি মন্দ তার অন্বেষণ কর ।-সে সব ছোট কথা - কেবল দশ টাকা লাভ হইলেই সব হইল - দূর - দূর !''[৫৩]

বিবাহ বিষয়ে টাকার লোভ অনেকের মধ্যেই ছিল । তাই বাঞ্ছারামও বলেছেন - ''কুলও চাই - রূপও চাই - ধনও চাই । টাকাটা একেবারে অগ্রাহ্য করলে সংসার কিরূপে চলবে ?''[৫৪] বক্রেশ্বর বলেন - ''তা বই কি - ধনের খাতির অবশ্য রাখতে হয় । নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি ? সে আলাপে কি পেট ভরে ?''[৫৫] ষোল বৎসর বয়স হলেই তখন ছেলেদের বিবাহ দিতে পিতামাতা ব্যস্ত হতেন । এই কারণে মতিলালের ষোল বছর বয়স হতেই গৃহিণী বাবুরামবাবুকে বলেছিলেন - ''তুমি কেমন কথা বল শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেটের কোলে মতিলালের বয়েস ষোল বৎসর হইল - আর কি বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় ? একথা লইয়া এখন গোলমাল করিলে লগ্ন বয়ে যাবে , - কি করছো একজন ভালো মানুষের কি জাত যাবে?- বর নয়ে শীঘ্র যাও ।''[৫৬] মতিলালের এই নাবালক বয়সে বিবাহ নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল এবং তা বাবুরামবাবুকে বিচলিত করেছিল । কিন্তু গৃহিনীর প্রস্তাবে বিবাহ স্থির করতে বাধ্য হয়েছিলেন বাবুরামবাবু । সেকালের সমাজ - জীবনে অর্থলোভী পিতামাতার নাবালক পুত্রকেও বিবাহের দিকে এগিয়ে দিতে কুণ্ঠা ছিল না । লেখক তীব্র ব্যঙ্গের খোঁচায় মতিলালের বিবাহকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এই সমাজ চিত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন ।

বিবাহকে কেন্দ্র করে স্ত্রীলোকদের বরকে নিয়ে কৌতুক , ঠকচাচার উপস্থিতিতে কৌতুককর পরিবেশ থেকে গোলযোগের সূত্রপাত এবং বিবাদের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হবে কিনা এ বিষয়ে মতিলালের আশঙ্কা ও বিয়েকে অবলম্বন করে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা সব মিলে সেকালের একটি নিখুঁত বিবাহ বাসরের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।

বহুবিবাহ প্রথাকে কাজে লাগিয়ে তখন অনেক বয়স্ক মানুষ এমন কি বৃদ্ধ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করতে ব্যস্ত হতেন। উপন্যাসে বাবুরামবাবু বৃদ্ধ, তাঁর চুল পেকেছে, দাঁতও পড়েছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। অল্প বয়সে অনেকের এরূপ হয় - এই যুক্তি দাঁড় করিয়ে সংসারের প্রয়োজনেই যেন বাবুরামবাবু দ্বিতীয় বিবাহ করতে ব্যস্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেচারাম-বাবুকে বাবুরামবাবু স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন - ''আমাকে এদিক ওদিক সব-দিকেই দেখিতে হয়। দেখো একটা ছেলে বয়ে গিয়াছে আর একটা ছেলে পাগল হয়েছে - একটি মেয়ে গত আর একটা প্রায় বিধবা। যদি এ পক্ষে দুই একটি সন্তান হয় তো বংশটি রক্ষে হবে। আর বড়ো অনুরোধে পড়িয়াছি - আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায় - তাহাদিগের আর ঘর নাই।''[৫৭] নিজের পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়ে বৃদ্ধ পিতাও যে দ্বিতীয় বিবাহ করতে লোভী হয়ে উঠেছেন লেখক সে কথাই বাবুরামবাবুর মতো বৃদ্ধের বিবাহের উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এইরূপ বিবাহের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে কৌলীন্য প্রথার বিষময়তার চিত্রটিও পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। কিন্তু ধর্মের বিচারে, নীতি ও আদর্শের বিচারে প্যারীচাঁদ মনে করেছেন - ''এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম্ম কখনই করিতে পারেনা। যদ্যপি ইহার উল্টো কোন শাস্ত্রে থাকে সে শাস্ত্র মতে চলা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সে শাস্ত্র যে যথার্থ শাস্ত্র নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যদি এমন শাস্ত্র মতে চলা যায় তবে বিবাহের বন্ধন অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মন পুরুষের প্রতি তাদৃশ থাকেনা ও পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতি চল বিচল হয়, এরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারা মতে চলিতে পারেনা, এজন্য শাস্ত্র বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য।''[৫৮] তাছাড়া যে বাবুরামবাবু স্ত্রীর এত বশীভূত ছিলেন তাকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতে দেখে অবাক হতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই বিবাহ লিপ্সাকে লেখক তীব্র ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করেছেন।

উপন্যাসে শুধু মহিলাদের বিবাহ নিয়ে কৌতুকের আসর বিবাহ-বাসরে জমে ওঠেনি, বৃদ্ধ বয়সে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহেও স্ত্রীলোকদের মুখে কৌতুক, ব্যঙ্গ এবং সমালোচনার ভাষা বড় তীব্র। দাম্পত্য প্রেম বিকাশতো দূরের কথা বৃদ্ধ বরকে নিয়ে কনের জীবন যে দুঃসহ হয়ে উঠবে সেই কথাই মেয়েদের কথাবার্তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েরা বলেছে -'' আ মরি। কী চমৎকার বর। যার কপালে ইনি পড়বেন সে একেবারে এঁকে একেবারে চাঁপা ফুল করে খোপাতে রাখবে।''[৫৯] আবার কেউ বলেছে ''বুড়ো হউক ছুড়ো হউক তবু একে মেয়ে মানুষটা চকে দেখতে পাবে তো? সে ও তো অনেক ভাল।''[৬০] বৃদ্ধ বয়সে ভার্যা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ যে কত বিড়ম্বনা ও সমালোচনার বিষয় তা বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে পেরেছেন।

বাল্য বিবাহ প্রথার ফলে তখন মেয়েদের ছ'বছর বয়সেও বিয়ে দেওয়া হত। বিয়ের পর স্বামী কেমন তা অনেক স্ত্রী চোখেই দেখতে পেত না। তাছাড়া এই বাল্য কালে বিবাহ হওয়ার ফলে বিবাহ যে কী জিনিস সেই বোধ মেয়েদের মধ্যে বিবাহ কালে জন্মাত না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক মেয়েদের যে কোন অবস্থাকেই মেনে নিতে হত। তাছাড়া এক একজন কুলীন পঞ্চাশ-ষাটটি পর্যন্ত বিয়ে করতেন। এমন কি আশি বছর বয়স হলেও বর হতে বাধা নেই। আবার অনেক কে প্রতারণা করতেও দেখা গেছে। বর খুড়-খুড়ে বুড়ো, পণের টাকা গ্রহণ করেন, কিন্তু বিয়ে করতে আসেন না। এই বেদনায় বঞ্চিতা নারীকণ্ঠের ভাষা বেদনাময় হয়ে উঠেছে -''বড়ো অধর্ম না হলে আর মেয়ে মানুষের কুলীনের ঘরে জন্ম হয়না।''[৬১]

উপন্যাসে মতিলাল বিবাহ করেছে। কিন্তু বিপথগামিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হয়ে সে নিজেকে কেবলই নষ্ট করেছে। তার নিজের জীবনেও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা বা দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ তো ঘটেইনি পরিবর্তে চরম ঔদাসীন্য এবং অবহেলায় মতিলালের স্ত্রীর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু হিন্দু নারী প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী স্বামী মন্দ হলেও তার নিন্দা করা শ্রেয় নয় বলে মনে করতেন। তাই মতিলালের স্ত্রী বলেছে -''আমি স্বামীর নিন্দা করিনা - আমার কপাল পোড়া, তাহার দোষ কি? কেবল এইমাত্র বলি এক্ষণে যে ক্লেশ পাইতেছি স্বামী নিকটে থাকিলে এ ক্লেশ ক্লেশ বোধ হইত না।''[৬২] মতিলাল একটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে সেদিনের গোটা সমাজের চিত্রটি লেখক প্রকাশ করতে পেরেছেন। উপন্যাসের প্রায় সমাপ্তির কাছাকাছি এসে মতিলালের চিত্তশুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে যে অনুতাপ ও আক্ষেপের ভাষা ফুটে উঠেছে তাই দিয়ে নারী -পুরুষের সম্পর্কের অসারতা, দাম্পত্য প্রেমের অভাব জনিত বেদনা উপলব্ধির চিত্র অংকন করেছেন লেখক। আপন পত্নীকে দেখে মতিলালের মনে পূর্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। তাই মতিলাল তার মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছে -''মা আমি যেমন কুপুত্র, কুভ্রাতা তেমনি কুস্বামী- এমন সৎ স্ত্রীর যোগ্য আমি কোন প্রকারেই নহি। স্ত্রী পুরুষ বিবাহকালীন পরমেশ্বরের নিকট একপ্রকার শপথ করে যে তাহারা যাবজ্জীবন পরস্পর প্রেম করিবে, মহা ক্লেশে পড়িলেও ছাড়াছাড়ি হইবে না - স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি মন কখন হইবে না এবং পুরুষের ও অন্য স্ত্রীর প্রতি মন কদাপি যাইবে না - ঐ রূপ মননে ঘোর পাপ। এই শপথের বিপরীত কর্ম্ম আমা হইতে অনেক হইয়াছে তবে স্ত্রী কর্তৃক আমি পরিত্যক্ত কেন না হই?''[৬৩] মতিলালের এই পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে তার জীবনের বিপথগামিতা ও প্রচন্ড দুঃখবরণের অভিজ্ঞতা থেকে। লেখক প্যারীচাঁদ এই পরিবর্তিত মতিলালের বক্তব্যের মাধ্যমেই নর-নারীর বিবাহের উদ্দেশ্য এবং প্রেমের আদর্শ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে পেরেছেন।

'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে কাহিনীর সুচ্ছন্দ প্রবাহ রচনার চেষ্টা আছে, কিন্তু প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেমন করে প্রেম ও বিবাহ সমস্যার দিকে আলোকপাত করেছেন 'আলালের ঘরের দুলালে' তেমন কিছুই নেই। তবে উপন্যাসে কতগুলি ব্যক্তি-চরিত্রের সুরূপ উদ্ঘাটন করে প্রেমহীন বিবাহোত্তর জীবনে অর্থহীন দাম্পত্য জীবনের ছবিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। কখনও মেয়েদের মুখের ভাষায়, কখনও পুরুষের মুখে বিবাহ এবং বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা তখনকার সমাজ জীবনে যন্ত্রণার বিষয় হয়ে উঠেছিল তা লেখক ভালোই বর্ণনা করেছেন। বাল্যবিবাহের সমস্যা, বৈধব্য যন্ত্রণা, কৌলীন্য প্রথার বিভীষিকা, পুরুষের বহুবিবাহ, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ, বিবাহে পণ গ্রহণ সব মিলে বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক পর্বে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাস্তব চিত্রটিকেই সমাজ জীবন থেকে আহরণ করে সাহিত্যে স্থান করে দিয়েছে।

প্যারীচাঁদ মাঝে মাঝে কবিতার আশ্রয় নিয়ে ব্যঙ্গ ও কৌতুক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৌতুক ও ব্যঙ্গ একটা সময়ের বিশেষ সমাজ জীবনকেই তুলে এনেছে উপন্যাসে। শঠতার ও কুচক্রের খেলায় মত্ত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ঠকচাচা ও রামহরিরাম বাবুরামবাবুর আদুরে ছেলের বিবাহের আয়োজন পালটে মণিরামপুরের মাধববাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করার ঘটনায় যে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা সেদিনের সমাজ চিত্রটিকেই যেন মেলে ধরেছে। শুধু তাই নয় বাবুরাম-বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন এবং বিবাহ আসর থেকে পলায়ন কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, সমাজ ও সাহিত্য গ্রন্থে এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন - ''বিবাহের মত শুভ ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান-ও বাবুরাম ও তার কুসঙ্গীদের মত লোকদের অর্থ লোভ ও নীতিবোধহীনতার প্রভাবে যেভাবে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়, সেই সমাজ সমালোচনার সূত্রেই এই দেশজধারার

রঙ্গ ব্যঙ্গময় কবিতার ব্যবহার উপন্যাসের খীল্পের সংলগ্নতা ও সার্থকতা পেয়েছে।' উপন্যাসে বিচিত্র সমাজ সমালোচনার মধ্য থেকে প্রেমবিহীন নারী-পুরুষের জীবন, বিবাহের বেদনাময় পরিণতি, দাম্পত্য প্রেমের শুষ্কতায় একটি যুগের বেদনাময় জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে 'আলালের ঘরের দুলাল' সার্থক না হলেও বাংলা উপন্যাসের প্রারম্ভিক প্রয়াস প্রাক্-বঙ্কিমযুগে এক আশ্চর্য সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকেই নর-নারীর সামাজিক বিবাহের অন্তঃসার-শূন্যতার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রেম নয়, বিবাহ হয়ে উঠেছিল নারীর জীবন যন্ত্রণার এক নির্মম সামাজিক ব্যবস্থা।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে প্রেম ও বিবাহ সমস্যা আলোচনার পর প্রাক্-বঙ্কিম যুগের অপর এক সাহিত্যিক লালবিহারী দের কাহিনী ধর্মী রচনা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯ খ্রী:) গ্রন্থটির বিষয় বিন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুতেও আছে প্রেম ও বিবাহের সমস্যা। এখানে আছে চন্দ্রমুখীর বিবাহ প্রসঙ্গ। নায়িকা চন্দ্রমুখীর জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের অন্যান্য দিক তুলে ধরে বিবাহ ও দাম্পত্য প্রেমের স্বরূপ উল্লেখ করেছেন লেখক। এই সঙ্গে নায়ক হেমচন্দ্রের চারিত্রিক পতন এবং তার ফলে চন্দ্রমুখীর জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র রচনা করে একটি সুন্দর কাহিনী নির্মাণের প্রয়াস করা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন - ''চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে সমাজের আধুনিকীকরণের বিভিন্ন দিক, যথার্থ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের দোষ, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতির গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছে।''[৬৫] এই গ্রন্থ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ড: সুকুমার সেন বলেছেন - ''চন্দ্রমুখীর -উপাখ্যান আলালের ঘরের দুলালের অনুসরণে লেখা। প্যারীচাঁদের মতিলালই লালবেহারীর

হেমচন্দ্র প্রতিফলিত । একজনের পিতা আদর দিয়াছে , অপর জনের পিতা লালন করিয়াছে । ফলে দুই গ্রন্থের নায়ক দুই ভাবে বাড়িয়া উঠিয়া অবশেষে এক পরিণতি লাভ করিয়াছে । প্যারীচাঁদের তুলনায় লালবেহারী উপন্যাসের দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছেন প্রণয় রসের কিঞ্চিৎ যোগান দিয়া ।''[৬৬]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮ খ্রী:) গ্রন্থেও আছে উপন্যাসের মৃদু লক্ষণ । এর কাহিনীতে আছে নায়কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত । যাহাতে করে নায়ক বেরিয়ে পড়েছে ভ্রমণে । কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ের দাপটে প্রাণ রক্ষার তাগিদে ছোট একখানা ডিঙি নিয়ে তাকে আসতে হয়েছে ত্রিবাঙ্কুর উপকূলে। তারপর বহু পথ পাড়ি দিয়ে সে এসেছে পুরীর কাছে । সমগ্র কাহিনীতেই আছে অল্প - বিস্তর প্রেমের চিত্র । নায়ক দুরাকাঙ্ক্ষের সঙ্গে কমলাদির প্রেম ও বিবাহ , মানবের রাজকুমারীর প্রেম ও প্রত্যাখ্যান , বন্যযুবতীর কাছে দুরাকাঙ্ক্ষের আশ্রয় গ্রহণ ও পলায়ন এবং উড়িষ্যার কুটির বাসিনী (পারিয়ার) মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহসব মিলে নায়ক দুরাকাঙ্ক্ষের জীবনে প্রেম ও বিবাহের বিষয়কেই কাহিনীর উপজীব্য করা হয়েছে ।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৯ - ৬০ খ্রী:) গ্রন্থেও পারিবারিক জীবনের বহু সমস্যার চিত্রায়নের ফাঁকে ফাঁকে বাল্য - বিবাহের সমস্যা এবং বালবিধবার পুনরায় বিবাহের প্রসঙ্গ আছে । গ্রন্থটির প্রকাশ উদ্দেশ্যমূলক , কিন্তু এর কাহিনী নির্মানের প্রয়াসের মধ্যেও বাংলা - উপন্যাসের আবির্ভাবের আভাস মেলে ।

১৮৬০ খ্রী: গোপীমোহন ঘোষ লিখেছেন 'বিজয়বল্লভ' । এই গ্রন্থকে রাজনারায়ণ বসু প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে মনে করেছেন । তিনি বলেছেন - ''পাইকপাড়ার রাজাদিগের সম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা । তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিসৃত হয় , সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয়বল্লভ' ... ।''[৬৭] গোপীমোহন ইংরেজী উপন্যাস

সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন , একথা সত্যি কিন্তু গোপীমোহনের কাহিনী উপন্যাস হয়ে ওঠেনি । ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন - ''প্রচলিত একটি রূপকথাকে[৬৮] উপন্যাসের ছাঁচে ঢালিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ' বিজয়বল্লভ'এ।' এর কাহিনীতে আছে রূপকথার গল্প । তবু নর - নারীর জীবনের প্রধান সমস্যা প্রেম ও বিবাহকে প্রাক্ - বঙ্কিম যুগে উপন্যাস রচনার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে সমকালীন জীবনযাপনের চিত্র নেই , কিন্তু মানব - মানবীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে এই প্রেম ও বিবাহ চিত্রণ সেদিনের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে । নায়ক বিজয়বল্লভকে জন্মের পর সরযূর জলে নিক্ষিপ্ত করার পর কিভাবে এক জেলে তাকে রক্ষা করে এবং মগধের ধনবান বণিক ধনপতি তাঁকে সেই জেলের কাছ থেকে কিনে নেবার পর সযত্নে বড় করেন সেই কাহিনী দিয়েই রচিত হয় 'বিজয়বল্লভ' । এই বিজয়বল্লভই একদিন বড় হয়ে মগধের রাজপুত্র শান্তশীলের সাহচর্যে আসেন । তারপরের ঘটনা প্রণয় - প্রসঙ্গ । নায়ক বিজয়বল্লভের সঙ্গে রাজকন্যা চম্পকলতার প্রেম । বিজয়বল্লভ ও চম্পকলতার মধ্যে পারস্পরিক প্রণয় - নিবেদন এবং তাঁদের এই প্রণয়ের সমস্যা হিসেবে পাতঙ্গি বা সোমদত্তর ষড়যন্ত্রের ফলে জটিলতা সৃষ্টি এবং প্রকৃত পরিচয় প্রকাশের পর চম্পকলতার সঙ্গে বিজয়বল্লভের বিবাহ - এত সব ঘটনা কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । বঙ্কিম - চন্দ্রের উপন্যাস তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি , বাংলা উপন্যাসের সার্থক আঙ্গিকের প্রকাশ তখনও ঘটেনি , কিন্তু উপন্যাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সবে মাত্র কারো কারো রচনায় স্থান পেয়েছে । এমনই এক সময়কালে গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ' বাংলা উপন্যাসের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলেও কাহিনীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রচনাটিকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের গোড়াপত্তনের কালে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে । সেই প্রস্তুতির যুগে গ্রন্থটি প্রেম ও বিবাহ সমস্যার এক অনবদ্য কাহিনী নির্মাণে সক্ষম হয়েছে ।

-*- *-

উল্লেখপঞ্জী

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ , ১৯৯২ , মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি: , কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩ , পৃষ্ঠা - ২৮

২। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার , দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস ১ম খন্ড (সম্পাদনা) , প্রথম প্রকাশ , জুলাই , ১৯৯২ , নবধারা , অমৃতধারা , কলিকাতা - ৭০০ ০০১ , পৃষ্ঠা - ১০ (ভূমিকা)

৩। সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : তৃতীয় খন্ড , প্রথম আনন্দ সংস্করণ , ১৪০১ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা - ১ , পৃষ্ঠা- ১৬৪

৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ , ডিসেম্বর ১৯৮৮ , দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩ , পৃষ্ঠা - ৭৪

৫। ক্ষেত্রগুপ্ত , বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস , প্রথম খন্ড , নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ , আগষ্ট ১৯৯৬ , গ্রন্থনিলয় , কলিকাতা - ১ , পৃষ্ঠা - ৫৭

৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার , দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস ১ম খন্ড (সম্পাদনা) জুলাই , ১৯৯২ , নবধারা , অমৃতধারা , কলিকাতা - ৭০০ ০০১, পৃষ্ঠা - ১ (ভূমিকা)

৭। তদেব , পৃষ্ঠা - ১ (ভূমিকা)

৮। ক্ষেত্রগুপ্ত , বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস , প্রথম খন্ড , নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ , আগষ্ট , ১৯৯৬ , গ্রন্থনিলয় , কলিকাতা - ১ , পৃষ্ঠা - ৫৬

৯। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস ১ম খন্ড (সম্পাদনা) জুলাই ১৯৯২, নবধারা, অমৃতধারা, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা - ১০৩ (ফুলমণি ও করুণার বিবরণ)

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৫

১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৫

১২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০৭

১৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভূদেব-রচনা সম্ভার (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত), তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৭৫, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা - ১২, পৃষ্ঠা - ২৬৬

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - দ৵০

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৭

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৭

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮

২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭৮ - ২৭৯

২২। তদেব, পৃষ্ঠা - দ৵০

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৩

২৪। তদেব , পৃষ্ঠা - ২৮৫

২৫। তদেব , পৃষ্ঠা - ২৮৫

২৬। তদেব , পৃষ্ঠা -২৮৫ -২৮৬

২৭। তদেব , পৃষ্ঠা -২৮৮

২৮। তদেব , পৃষ্ঠা -২৮৮

২৯। তদেব , পৃষ্ঠা -২৯১

৩০। তদেব , পৃষ্ঠা -২৯১

৩১। তদেব , পৃষ্ঠা -২৯২

৩২। তদেব , পৃষ্ঠা -২৯৬

৩৩। তদেব , পৃষ্ঠা -২৯৬

৩৪। তদেব , পৃষ্ঠা -৩১৬

৩৫। তদেব , পৃষ্ঠা- ৩৩০

৩৬। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩০ - ৩৩১

৩৭। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩১

৩৮। তদেব , পৃষ্ঠা- ৩৩১

৩৯। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩৪

৪০। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩৭

৪১। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩৮

৪২। তদেব , পৃষ্ঠা -৩৩৮ -৩৩৯

৪৩। টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত), চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৮১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা - ।।৵০ (ভূমিকা)

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা — ৸৵০ (ভূমিকা)

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠা — ।৶০ (ভূমিকা)

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা ।।৵০

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮

৪৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০

৫০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০

৫১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫

৫২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৬

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৬

৫৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৩

৫৯। তদেব , পৃষ্ঠা - ৭৫

৬০। তদেব , পৃষ্ঠা - ৭৫

৬১। তদেব , পৃষ্ঠা - ৭৫

৬২। তদেব , পৃষ্ঠা - ১২২

৬৩। তদেব , পৃষ্ঠা - ১৩২ -১৩৩

৬৪। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত , প্যারীচাঁদ মিত্র : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য : প্রথম সংস্করণ , নভেম্বর - ১৯৮১ , জয়দুর্গা লাইব্রেরী , কলিকাতা - ৭০০ ০০১ , পৃষ্ঠা - ৬২১

৬৫। তদেব , পৃষ্ঠা - ৭২৪

৬৬। সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , তৃতীয় খন্ড : প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা - ১, পৃষ্ঠা- ১৬৬

৬৭। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত , প্যারীচাঁদ মিত্র : সমাজচিন্তা ও সাহিত্য , প্রথম সংস্করণ , নভেম্বর - ১৯৮১ , জয়দুর্গা লাইব্রেরী , কলিকাতা - ৭০০ ০০১, পৃষ্ঠা - ৬১৭

৬৮। সুকুমার সেন , বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , তৃতীয় খন্ড , প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১ , আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলিকাতা -১, পৃষ্ঠা - ১৭০ ।

--*